

Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

"ঘাটের কথা" : রবীন্দ্র-গল্পশৈলীর চিহ্নবিশ্ব

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Shahrier Rahman
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).9
Pages	165-179
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯, সংখ্যা : ৩ ॥ আষাঢ় ১৪১৯ ॥ জুন ২০১২

"ঘাটের কথা" : রবীন্দ্র-গল্পশৈলীর চিহ্নবিশ্ব

Check for updates

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান*

ঘাটের কথামালা (discourse) নিয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্র ছোটগল্প "ঘাটের কথা"। স্মরণ রাখা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ষোল বছর বয়সে লেখা "ভিখারিনী"-র মধ্য দিয়ে তাঁর ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। "ভিখারিনী" গল্পটিকে শনাক্ত করা হয়েছে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের 'অবিরল উত্তাপ-উৎস'রূপে (সৈয়দ আকরম; ১৯৯৭:১৪)। আমরা এই মত অস্বীকার না করে এর অধিকতর সম্প্রসারণে আগ্রহী। আমাদের বিবেচনায়, "ভিখারিনী" রবীন্দ্র-ছোটগল্পের খেরো খাতা। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প নিয়ে যা ভেবেছেন, তার খসড়া পরিকল্পনাটি পাওয়া যায় এই গল্পে। নানা ধরনের ছোটগাল্পিক অনুষঙ্গ তথা প্যারাডাইমগুচ্ছ তিনি জড়ো করেছেন এখানে; এর কিছু হয়ে উঠেছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সঙ্গী, কিছু গোড়াতেই বাতিল হয়ে গেছে। আমরা মনে করি, গ্রহণ-বর্জনের এই খসড়া আয়োজনকে পরিপাটি করে শিল্প-ঋদ্ধ ছোটগল্প রচনার ছাঁচটি (matrix) গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের "ঘাটের কথা" গল্পে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার প্রারম্ভ পর্যায়ের এই গল্পে লেখক অণু-অবয়বে উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্প-পরিকল্পনার বিভিন্ন অনুষঙ্গ। "ভিখারিনী"-তে যারা উপস্থিত, "ঘাটের কথা"-য় তারা শিল্পঋদ্ধভাবে উপস্থাপিত; ভবিষ্যৎ-ব্যবহারের সম্ভাবনায় সংহত। এই সুদূরপ্রসারী অনুষঙ্গসমূহ গল্পটির শৈলীবৈজ্ঞানিক (stylistic) কাঠামোকে আশ্রয় করে পরিকল্পিত এবং উত্তরকালে রচিত বিভিন্ন রবীন্দ্র-গল্পে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনায় শৈলী-চিহ্ন রূপে আলোচ্য গল্পের পাঠে সংরক্ষিত হয়েছে। গল্পের শৈলী সংশ্লিষ্ট এই চিহ্নসমূহ একত্র হয়ে সৃষ্টি করেছে এক নান্দনিক চিহ্নবিশ্ব (semiosphere), যা গল্পটির কথামালার এক বিশেষ তাৎপর্যবাহী বিশেষত্ব। অর্থাৎ সহজ করে বললে, সমগ্র রবীন্দ্র-ছোটগল্পের কথামালায় শৈলীগত পরিচর্যার অংশ হিসেবে যেসকল শিল্পকৌশল লক্ষ করা যায়, তাদের অনেকগুলোই চিহ্ন (sign) আকারে দ্যোতিত হয়েছে আলোচ্য "ঘাটের কথা" গল্পে। এই চিহ্নগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত, এবং সম্মিলিতভাবে এরা হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-গল্পশৈলীর দ্যোতনার (signification) প্রতিনিধি; এতে করে জন্ম নিয়েছে গল্পশৈলীর চিহ্নবিশ্ব। উল্লিখিত এই অনুকল্পকে (hypothesis) সপ্রমাণ উপস্থাপন করাই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অভীষ্ট। এক নজরে আলোচ্য গল্পটিকে বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, অপেক্ষাকৃত সরল ও সংক্ষিপ্ত কাহিনিসূত্রকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে এর পাঠ (text)। এতে একজন সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টার চরিত্রে আবির্ভূত হয়েছে গঙ্গার নদীঘাট। প্রতীকী তাৎপর্যে বিন্যস্ত এই ঘাটের সরব উপস্থিতি লেখক-জবানিকে ছাপিয়ে গিয়ে গল্পের নাম-চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কেবল কথক-এর গণ্ডিতে নিজেকে না বেঁধে গল্পের ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে সে এমনভাবে মিশে গেছে যে, তার বস্তুজাগতিক জড়-অস্তিত্ব সম্পর্কে পাঠক ক্রমশ বিস্মৃত হতে বাধ্য হন। ফলে, গল্পটির সাদামাটা ন্যারেটিভ পাঠকের কাছে তাৎপর্যবাহী সংবেদনা

*সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সঞ্চারের চাইতে এর আনুষঙ্গিক শৈলী-বৈশিষ্ট্য, বিশেষত ঘাট-চরিত্রটির বয়নকৌশল পাঠককে মুগ্ধ করে রাখতে তৎপর থাকে। পাঠকের এই শিল্প-মুগ্ধতার উত্তর-প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছোটগল্পে সম্প্রসারিত হয়েছে— এই অভিমতের যৌক্তিক মীমাংসার পূর্বে শৈলী ও চিহ্নের তাত্ত্বিক কাঠামো বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

শৈলী ও চিহ্নবিশ্ব

সাহিত্যে শৈলী ও চিহ্নের বাহন হলো সুপরিকল্পিত ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ভাষা। তাই বলা যায় যে, শৈলীবিজ্ঞান এবং চিহ্নবিজ্ঞান সাহিত্যে প্রযুক্ত-ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই ব্যাখ্যা করে। এর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত হয় নান্দনিকতা। একটি সাহিত্যকর্মের রূপায়ণের প্রক্রিয়া অনুধাবনের উপায় হলো এর শৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, এতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলোর ব্যবহার-তাৎপর্য কীরূপ তা নান্দনিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা। প্রাথমিকভাবে, শৈলীবিজ্ঞান সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার বস্তুবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে আগ্রহ প্রকাশ করলেও সাহিত্যের নান্দনিক প্রান্তটিকে অনালোকিত রেখে এর শৈলীগত উচ্চতাকে (stylistic sublimity) অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এখন এই নান্দনিক বিশেষত্বকে আয়ত্ত করতে হলে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে বাগর্থ বিন্যাসের যে বহুস্তরিক দ্যোতনা সঞ্চারিত, তাকে ব্যাখ্যাযোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। আবার পাঠ-বিন্যস্ত দ্যোতক আর দ্যোতিতগুলোকে শনাক্ত করতে না পারলে উল্লিখিত ওই দ্যোতনার পরিপূর্ণ উপলব্ধি অসম্ভব। এই সূত্র ধরে বলা যায় যে, পাঠের দ্যোতনা-কাঠামোকে ব্যাখ্যা করে চিহ্নবিজ্ঞান। এ কারণে, সাহিত্যের শৈলীকে তার নান্দনিক সৌকর্যের ভিত্তিতে অনুধাবন করতে হলে পাঠ-বিন্যস্ত চিহ্নসমূহের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হলো, পাঠ-বিন্যস্ত এই চিহ্নগুলোর সঙ্গে শৈলীর সম্পর্কটি কীরূপ। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে আপাতভাবে মূল গল্পের বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রবিবার" শীর্ষক ছোটগল্প থেকে গৃহীত নিচের দৃষ্টান্তটি বিবেচনা করা যেতে পারে :

> রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্সেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালি-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৬৬৫)

দৃষ্টান্তটি সংশ্লিষ্ট ছোটগল্পের শৈলীগত নির্যাসকে ধারণ করে আছে। কীভাবে; তা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উদ্ধৃতাংশের প্রথম বাক্যটি থেকেই এর সূচনা। শৈলীবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে, বাক্যটির সূত্র ধরে গল্পের প্রমুখনের (foregrounding) কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। প্রমুখন নিয়ে আমরা এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোকপাত করব। তবে সহজ করে বলা যেতে পারে, গল্পের নামকরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় এই বাক্যে। ছুটির দিন রবিবার অবসরের কাল। কেজো সময়ের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসা সপ্তাহান্তের এই সময়টুকুকে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়বৃত্তি অনুধাবনের ও অনুশীলনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাই যে কর্মযোগ আধুনিক মানুষের জীবনে অলঙ্ঘনীয় সত্য তারই ফাঁকে আবেগী অনুভবের এক খণ্ড সময়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে এই 'রবিবারের দিন'। এই রকম কোনো এক রবিবারের সকালবেলাতেই গল্পের মুখ্য দুই চরিত্র

অভীক এবং বিভা পরস্পরের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের নিবিড় উপলব্ধিকে তারা তুলে ধরেছে। রবীন্দ্রনাথ 'রবিবার সকালবেলা' বাক্যটিকে পাঠের এমন এক স্থানে ব্যবহার করেছেন, যার পর থেকেই গল্প ক্রমশ গভীরতর মানবানুভূতিকে ধারণ করে পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। বাক্যটি যেন গল্পের অবশিষ্ট কথামালার প্রতিনিধি হয়ে এগিয়ে এসেছে তথা প্রমুখিত হয়েছে। একইসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, প্রমুখিত এই বাক্যটি গল্পের শৈলীগত বিশেষত্বকে প্রকাশ করবার সাথে সাথে হয়ে উঠেছে অতলস্পর্শী মানবানুভূতির প্রতীক চিহ্ন (symbolic sign)। আবার, এর সন্নিহিত বাক্যগুলোতে লেখক উপস্থাপন করতে চেয়েছেন গল্পটির দ্বন্দ্ব-স্রোতের প্রধান ধারাসমূহ। আর তাই তিনি নিয়ে এসেছেন গল্পের অন্যান্য প্রতিনিধিত্বশীল চিহ্ন। গল্পটির পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে, প্রচল ধর্মমতের বিপরীত প্রান্তে অভীকের অবস্থান। রবীন্দ্রনাথ যেন তাই ইচ্ছে করেই ভাষাভঙ্গির বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে বিভার ব্রহ্ম-উপাসনা আর অভীককে একই সময়খণ্ডে উপস্থাপন করেন। 'নাস্তিক্যবোধ'— যা এই গল্পের অন্যতম চিহ্ন, তাকে গল্পকার কৌশলে সমন্বিত করেছেন উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশে; অস্বীকার এবং আরাধনাকে তিনি বিপ্রতীপতা দিয়েই অভিন্ন অবস্থান প্রদান করেছেন। ফলে, অন্তর্লীন দ্যোতনাবাহী চিহ্নরূপে এটি স্থান করে নিয়েছে এই গল্পে। এরই সমান্তরালে, রবীন্দ্রনাথ গল্পের আরেকটি চিহ্ন 'অভীকের চিত্রাংকন প্রতিভা'কে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। ফেলে দেওয়া কাগজে অভীকের ছবি আঁকার বিবরণ তুলে ধরে একদিকে গল্পকার অভীকের শিল্পীপ্রতিভার অনাদরের ইঙ্গিত দেন; অপরদিকে, 'আঁচড়কাটা ছবির' প্রসঙ্গ এনে রূপকাভাস (metonymy) ব্যবহার করে তিনি পাঠকদেরকে জানিয়ে দেন— অভীকের ছবি আঁকা বিভার হৃদয়ে কতটা আঁচড় কাটতে সক্ষম হবে। অলঙ্কারপূর্ণ ভাষিক শৈলীর ব্যতিক্রমী ব্যবহার ঘটিয়ে গল্পটিতে জন্ম নেয় আরেকটি চিহ্ন। লক্ষ করা যায় যে, প্রমুখিত বাক্য প্রয়োগ, বিষয়গত সমান্তরালতা (parallelism), আলংকারিক প্রয়োগের মতো বিভিন্ন শৈলী-উপকরণ— রবীন্দ্রনাথের অনন্য ভাষা-দক্ষতায় জন্ম দিয়েছে একাধিক নান্দনিক গুণসমৃদ্ধ চিহ্ন। শৈলী-আশ্রিত এই চিহ্নগুলোর দ্যোতনা যে ব্যাপকতা-সঞ্চারী তার প্রমাণ মেলে গল্পের একেবারে শেষ কয়েকটি বাক্যে। বিভাকে সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে লেখা অভীকের একটি পত্রের মধ্য দিয়ে শেষ হয় গল্পটি। এই পত্রের শেষ কয়েকটি বাক্য এরকম :

> আবার আমি ফিরব— তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনো না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছ আমাকে— আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৬৭৭)

লক্ষণীয়, অভীকের এই স্বোপার্জিত অনুভবকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে গল্পকার যেন "রবিবার" থেকে নেওয়া পূর্বের উদ্ধৃতিটিতে বিন্যস্ত শিল্পসমস্যারই সমাধান উপস্থাপন

করেছেন। পূর্বের উদ্ধৃতিতে যে শৈলী-আশ্রয়ী চিহ্নগুলো উপস্থাপিত হয়েছিল, তাদের তাৎপর্য এবং সংবেদনাকে তুলে ধরা হয়েছে এই সমাপ্তি বাক্যগুচ্ছে।

সুতরাং বলা যায় যে, একটি পাঠের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য বিবিধ চিহ্নের সাহায্যেই বিকশিত হয়। তাই চিহ্নসমূহের বিশ্লেষণে ওই পাঠের শৈলীকে আত্মস্থ করা যেতে পারে। কিন্তু আরেকটি বিবেচনাও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। একজন সাহিত্যিকের ব্যবহৃত শৈলীর একটি আন্তঃপাঠের জগৎও রয়েছে। অর্থাৎ, তিনি যা রচনা করেন, সেসব রচনার পাঠে ব্যবহৃত শৈলীর মধ্যে ব্যঞ্জনাগত সাধর্ম লক্ষ করা যায়। সাহিত্যিক একটি পাঠে যে ধরনের শৈলীবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেন, তা তাঁর বিভিন্ন রচনায় ফিরে ফিরে আসে। আর এভাবে ফিরে আসাটা যখন একঘেয়ে কোনো বিষয় না হয়ে বরং সাহিত্যিকের শৈলী ভাবনার বহুমাত্রিকতাকে প্রকাশ করে তখনই তা হয়ে ওঠে সাহিত্যিকের আইডেনটিটি; রচিত হয় ওই সাহিত্যিকের নিজস্ব কথামালার কাঠামো। সুতরাং, একজন সাহিত্যিকের কথামালা গড়ে ওঠে তাঁরই ব্যবহৃত শৈলী-চিহ্নের সমন্বয়ে। এই শৈলী-চিহ্নগুলো কখনও কখনও একজন সাহিত্যিকের সাহিত্য সাধনার বিস্তৃত পরিসরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; আবার কখনও (বিশেষ করে মহৎ সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে) বিশেষ কোনো সাহিত্যের পাঠে অণু-অবয়বে তাঁর নিজস্ব শৈলী-চিহ্নগুলো অবস্থান করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ওই সাহিত্যের পাঠটি হয়ে ওঠে সাহিত্যিকের শৈলী ব্যবহারের বীজসূত্র তথা বীজপাঠ। অর্থাৎ, বীজপাঠের শৈলী-চিহ্নগুলো কেবল ওই পাঠের অংশ না হয়ে ভবিষ্যতের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা ব্যক্ত করে। ফলে, ওই বীজপাঠে ব্যবহৃত শৈলী-চিহ্নগুলো জন্ম দেয় এক চিহ্নবিশ্বের। চিহ্নবিজ্ঞানের (semiotics) তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসারে বলা যায় যে, পরস্পর-সম্পর্কিত প্রতিবেশে অবস্থিত একগুচ্ছ চিহ্ন যখন মিলিতভাবে অভিন্ন কোনো দ্যোতনার জন্ম দেয় তখনই চিহ্নবিশ্ব রূপ লাভ করে (Lotman: 2005)। এর সূত্র ধরে আমরা পূর্বে উল্লেখিত "রবিবার" গল্পটিতে পুনরায় ফিরে যেতে পারি। লক্ষণীয় যে, "রবিবার" থেকে নেওয়া প্রথম উদ্ধৃতিতে একাধিক শৈলী-আশ্রয়ী চিহ্নের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম। এই সবগুলো চিহ্ন পরস্পর-সম্পর্কিত পরিবেশে জন্ম নেওয়া এবং গতিময় পৃথিবীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী আধুনিক মানুষের সুগভীর জীবনানুভবের দ্যোতনায় অভিব্যঞ্জিত। ফলে, "রবিবার" গল্পের পাঠের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি হয়েছে এক চিহ্নবিশ্বের। আবার, যেহেতু আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, মহৎ সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে বীজপাঠে বিন্যস্ত চিহ্নগুলো ফিরে ফিরে নতুনতর মাত্রায় তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় সেহেতু ওই বীজপাঠের চিহ্নগুলো হয়ে ওঠে বিশেষ তাৎপর্যবাহী। বস্তুত, একটি রচনার পাঠ যখন সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের সামগ্রিক সৃষ্টির চিহ্নবিশ্বে পরিণত হয় তখন ওই বীজপাঠের বিশ্লেষণ তাঁর নিজস্ব কথামালার প্রধান দিকগুলোকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একটি পাঠের শৈলীবিচার ওই পাঠে বিন্যস্ত চিহ্নসমূহকে স্পষ্ট করে তোলে, আবার চিহ্নগুলোর দ্যোতনা বিচারের মধ্য দিয়েও ওই পাঠের শৈলীকে অনুধাবন করা যেতে পারে। সর্বোপরি, এই উভমুখী প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের কথামালাকে একটি নন্দন-স্বচ্ছ অবয়ব প্রদান করে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা "ঘাটের কথা"-র শৈলীবিচারের মধ্য দিয়ে ওই পাঠের শৈলী-চিহ্নগুলোকে শনাক্ত করতে সচেষ্ট হব। একইসঙ্গে, শনাক্তকৃত শৈলী-চিহ্নগুলো কীভাবে চিহ্নবিশ্ব প্রস্তুতিতে ভূমিকা পালন করছে তা বিবেচনা করব। এই মূলনীতিকে সামনে রেখে আমরা প্রথমত শৈলীবিচারের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করব। বলা যেতে পারে যে, 'শিল্পভাবনার মূর্ত রূপ শৈলীতে, আর শৈলীর সংজ্ঞার্থ বহুবস্তুজ্ঞাপক। আলাদা-আলাদা শব্দ, শব্দ-সমাবেশ, শব্দের অর্থ ও ধ্বনি, যোজিত শব্দের দৃশ্য ও শ্রুতিরূপ শব্দের ইমেজ্ বা বাক্প্রতিমা, তার প্রতীকী অর্থ, বহুস্তরে বিন্যস্ত অথবা সুস্পষ্ট ঋজু অর্থ, তার সেন্সুয়াস বা ইন্দ্রিয়বেদী দ্যোতনা, ভাবনাধর্মিতা, সংক্ষেপে ভাষার অবয়বী ও আন্তর সম্পর্ক, এর সমস্তই শৈলীবিচারের অন্তর্গত' (অমলেন্দু; ২০০৮:১৯৯-২০০)। শৈলীবিচারে ব্যবহৃত এইসব উপাদানের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এদের প্রতিটিই ভাষা-সংশ্লিষ্ট; এবং একইসঙ্গে এরা ভাষার বোধের সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত তেমনি প্রয়োগের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। আরও উল্লেখ্য যে, সাহিত্যের শৈলীবিচারে আলংকারিক ভাষার (figurative language) বিশ্লেষণও অপরিহার্য। কেননা, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আলংকারিক ভাষার নান্দনিক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই একজন সাহিত্যিকের সৃজনপ্রতিভার মৌলিকত্ব প্রকাশিত হয়। তাই শৈলীবিচারের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে সাহিত্যের ভাষা-নির্ভর বিশেষত্বকে আবিষ্কার করা। আর এর জন্য প্রয়োজন হয়, উদ্দিষ্ট পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে শৈলী-সূচকসমূহের (style markers) একটি তালিকা (inventory) তৈরি করা এবং পাঠের সঙ্গে এদের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা (Enkvist; 1964:38)। আমাদের আলোচ্য "ঘাটের কথা" গল্পের শৈলীবিচারের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করব, তার মধ্যে রয়েছে : পাঠটির বিচ্যুতি (deviation), প্রমুখন, সমান্তরালতা, ভাষিক পারম্পর্য (cohesion), আলংকারিক উপাদান ও ক্রিয়াশৈলী।

উপর্যুক্ত এই প্রক্রিয়ায় পাঠের শৈলীবিচারের মধ্য দিয়ে এর শৈলী-চিহ্নগুলোকে শনাক্ত করা সম্ভব। প্রাপ্ত শৈলী-চিহ্নগুলোকে বিভিন্ন রবীন্দ্রগল্পের আলোকে বিচার করে এই পর্যায়ে দেখা হবে যে, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছোটগল্পে ওই শৈলী-চিহ্নগুলোর প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু; চিহ্নগুলো প্রকৃত অর্থেই কোনো চিহ্নবিশ্ব সৃজন করতে সক্ষম কি না। যদি এই প্রাসঙ্গিকতা ও সক্ষমতা প্রমাণ করা সম্ভব হয় তবেই আমাদের গৃহীত অনুকল্পটি সত্য বলে প্রতীয়মান হবে।

"ঘাটের কথা"-র পাঠ : শৈলী বিচার

অকাল বৈধব্যের শিকার কুসুম নামের এক নারীর সমাজ-অসিদ্ধ একতরফা প্রেম এবং মৃত্যুময় পরিণতির কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে গল্পটি। কিন্তু এভাবে বর্ণনা করলে "ঘাটের কথা"-র সাহিত্যিক সৌকর্যের কিছুই উদ্ঘাটিত হয় না; গল্পটির নান্দনিক উচ্চতাও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে, গল্পটিতে বর্ণিত এই কাহিনি এর মুখ্য শিল্প-প্রকৌশল নয়। রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছেন এর উপস্থাপনায়, বিশেষত নদীঘাট-কে চরিত্রায়িত করবার মধ্য দিয়ে। এই কৌশলের অবলম্বন গল্পটিকে শৈলীবিজ্ঞানের পরিভাষায় করে তুলেছে বিচ্যুত। আমরা জানি, শৈলীবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসারে একটি

পাঠের স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ প্রকাশিত হয় এর বিচ্যুতির সূত্র ধরে। অর্থাৎ, বিচ্যুতির উপস্থিতি একটি পাঠকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে, পাঠের অনন্যতাকে সুস্পষ্ট করে। আলোচ্য গল্পে লেখক গঙ্গার নদীঘাট-কে একটি সবাক চরিত্ররূপে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু থেকেই এই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছেন। বক্ষ্যমাণ আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এই গল্পে নদীঘাটটি কেবল লেখকের প্রতিনিধি হয়ে কথক-সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; হয়ে উঠেছে গল্পের একটি চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ এর সাহায্যে সৃষ্টি করেছেন এক কালদ্রষ্টা চরিত্র। গঙ্গার গতিপ্রবাহের মতোই এই ঘাট, সময়-স্রোতের অভিঘাতে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। এই নদীঘাট-কে কেন্দ্র করে যে বিশাল মানবদল তাদের জীবন যাপন করে বা করেছে, ঘাটটি তাদের প্রতিদিনের বয়ে চলার পর্যবেক্ষক। এই পর্যবেক্ষণের শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় তা কারও জানা নেই। প্রচল চরিত্রকাঠামোর বাইরে গিয়ে একটি জড়বস্তুকে কল্পপ্রাণ চরিত্ররূপে উপস্থাপন করা গল্পটির বিচ্যুতি-বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল স্মারক। বিচ্যুতির এই বিশেষত্ব আরও খুঁজে পাওয়া যায়, গল্পের কাল নির্দেশনায়, বর্ণনাভঙ্গির নির্বিশেষ থেকে বিশেষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে। গল্পের কাল নির্দেশনা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, গল্পটি শুরু হয়েছে 'আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে' এমন সময়ে। আর গল্পটির পরিণতি পর্ব শুরু হয়েছে 'ভাদ্র মাসের শেষাশেষি'। যদিও গল্পের সমাপ্তি-পর্বটি কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছে, কিন্তু সেটির কারণ মূলত গল্প-সমাপ্তিকে পাঠকের কাছে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা। এই পর্বটি যেন একটি সময়-খণ্ডে উপস্থাপিত। আর তাই, গল্পকার ভাদ্র মাসের শেষভাগে তাঁর গল্প শুরু করে নিপুণ কৌশলে বহু বছরের বর্ণনা তুলে ধরে আবার অন্য কোনো এক বছরের ভাদ্র মাসের শেষভাগে এসে গল্পের সমাপ্তি অংশে উপনীত হয়েছেন। কালদ্রষ্টা নদীঘাটের চরিত্রের সঙ্গে চক্রাকারে সময়কে মিশিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচ্যুতি কৌশলকে করে তুলেছেন বহুস্তরবিশিষ্ট। গল্পটিতে বিচ্যুতি-কৌশল ব্যবহারের অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এর বর্ণনারীতি। গঙ্গার একটি সাধারণ ঘাট-কে লেখক যেমন অ-সাধারণ করে উপস্থাপন করেছেন, তেমনি এর বর্ণনায়ও এই অ-সাধারণত্ব প্রকাশ পেয়েছে ভাষাগত বিচ্যুতির সূত্র ধরে। নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, গল্পকার কী আশ্চর্য কৌশলে তাঁর বর্ণনাকে বিশেষায়িত করে তুলে সৃষ্টি করেছেন বিচ্যুতি :

> রাম-রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে হয় ; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ১)

যে কোনো একটি পাখি থেকে রাজহাঁস হয়ে ওঠার মধ্যে যেরূপ বিশিষ্টতা আছে, সেরূপ গল্পের নদীঘাটটিও লেখকের বর্ণনাগুণে বিশেষ হয়ে উঠেছে। বর্ণনার প্রতীকী কৌশল ব্যবহার করে লেখক গল্পটির বিচ্যুতির এই অন্যতম প্রান্তটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন।

বিচ্যুতির মতোই একটি পাঠ-কে শৈলীর মানদণ্ডে বিশিষ্ট করে তোলার অন্যতম উপায় হলো প্রমুখন। লেখক কখনও কখনও তাঁর বক্তব্যের নির্যাসকে রচনার শীর্ষভাগে উপস্থাপন করে তাঁর অন্বিষ্টকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে চান। এই প্রক্রিয়াটিই হলো প্রমুখন।

"ঘাটের কথা" গল্পের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ এই প্রমুখন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত, সূচনা অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয় :

> পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ১)

সমগ্র গল্প জুড়ে রবীন্দ্রনাথ যে কালপ্রবাহের গল্প বলেন, জড় আর প্রাণের যে রূপান্তরকে তুলে ধরেন, তার সবগুলো প্রান্তের ইঙ্গিত তিনি রেখে যান এই প্রমুখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পাঠককে তিনি প্রস্তুত করেন তাঁর অনন্য গল্পের মুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য। এই অনুচ্ছেদটি যেন পাঠকের উদ্দেশে লেখকের নির্দেশনা (guide line)। পাঠকেরা এই নির্দেশনা মেনেই গল্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং গল্পের নান্দনিক সার্থকতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গল্পে পাঠকের কাছে নিজের উপলব্ধিকে তুলে ধরার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করেন সমান্তরলতা কৌশল। সমান্তরলতা হলো অভিন্ন কাঠামোর বাক্য, পদগুচ্ছ কিংবা শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার। একই ধরনের ভাষিক উপাদান বারবার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকের সংবেদনাকে একটি বিশেষ পথে সঞ্চালিত করতে সচেষ্ট হন। তবে, কৌশলটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কখনোই এই সমান্তরলতার আয়তনকে দীর্ঘায়িত করেন না। এবং, আরও লক্ষণীয় যে, তিনি সমান্তরলতায় সচেতনভাবে ছেদ টানেন আকস্মিক বাক্য কিংবা বাক্যাংশ যোজনার মাধ্যমে। নিচের দৃষ্টান্তটি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৭)

কুসুমের আত্মহননের কালে নদীঘাটের বেদনাসিক্ত বর্ণনার অংশবিশেষ বিন্যস্ত হয়েছে ওপরের উদ্ধৃতিটিতে। এই বর্ণনায় দেখা যায় যে, 'আর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না'— এই বাক্যাংশটি হঠাৎ-ই ব্যবহৃত হয়ে অনুচ্ছেদের সমান্তর-যাত্রাকে আটকে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেন, মানব জীবনপ্রবাহের ছন্দপতনকেই এই সমান্তরলতার মাঝে আকস্মিক ছেদ টেনে প্রকাশ করতে আগ্রহী হন। আলোচ্য গল্পের শৈলীবিচারের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রান্ত হলো এর ভাষিক পারম্পর্য। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বক্তব্য ও বর্ণনার মধ্যে পারম্পর্য বিধান করে গল্পটি রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভাদ্র মাসের বর্ণনার সূত্র ধরে উপস্থাপিত পূর্ণযৌবনা নদীর বিবরণ :

> জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে— দুরন্ত যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ১)

ভাদ্র মাসের উল্লেখ এখানে নেই, অথচ প্রকৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ভাদ্র মাস-ই প্রকট হয়ে উঠছে। বক্তব্যের পরম্পরা বিধানের মধ্য দিয়ে লেখক প্রকৃতির এরূপ নান্দনিক বিবরণ উপস্থাপনে সচেষ্ট হন। এভাবে পরোক্ষ বিবরণের অধিকতর নান্দনিক রূপায়ণ লক্ষ করা যায় নিচের উদ্ধৃতাংশে :

> সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল। (বরীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৫)

সন্ন্যাসীর প্রেমে আপ্লুত কুসুমের বর্ণনা প্রদানের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ 'শিশিরধৌত পূজার ফুলের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ভাষিক পারম্পর্যের বিস্ময়কর কুশলতা লক্ষ করা যায় এর সন্নিহিত বাক্যটিতে। ওপরের দৃষ্টান্তের সবশেষে বিন্যস্ত এই বাক্যে আপাত অসংলগ্নভাবে রবীন্দ্রনাথ 'সুবিমল প্রফুল্লতা'য় কুসুমের শরীর আলোকিত করে তুলবার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রফুল্লতায় কি আলোকিত হওয়া সম্ভব? এর উত্তরটি লুকিয়ে আছে পূর্ব বাক্যে দেবতাকে উৎসর্গ করা পূজার ফুলের উপমায়। দেবতার পট কিংবা বিগ্রহ মন্দিরে নিত্য-আলোকিত থাকে। এই আলো প্রেমের, মুক্তির প্রতীক; ঠিক যেমন কুসুমের প্রাণের দেবতা, সেই সন্ন্যাসী তার জীবনে ক্ষণিকের আলো হয়ে এসেছিল। সন্ন্যাসীর আলোতেই আলোকিত হয়েছিল কুসুম। সন্ন্যাসী আর কুসুমের এই নিবিড়তাকে প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষিক পারম্পর্য সৃজন করেছেন।

আলোচ্য গল্পের শৈলীবিচারের সবচেয়ে নান্দনিক প্রান্ত— আলংকারিক ভাষার প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তাঁর গল্পকার সত্তার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এই গল্পে আলংকারিক ভাষার বিন্যাস ঘটিয়েছে। জড়পদার্থ নদীঘাটে প্রাণ আরোপের প্রয়োজনে এবং কালের প্রবাহকে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে বর্ণনার উদ্দেশ্যে গল্পকার কুসুমের বেদনাকে গভীরতর সংবেদনায়, বিবিধ আলংকারিক উপাদানে সমৃদ্ধ করেছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষাসহ বিভিন্ন অর্থালংকারের প্রয়োগ যেমন এই গল্পের পাঠে রয়েছে, তেমনি সূক্ষ্মভাবে ব্যবহৃত হয়েছে চিত্রকল্প ও প্রতীক। গল্পে ব্যবহৃত অর্থালংকারসমূহ সহজদৃষ্ট এবং নদীঘাটের বলে যাওয়া বিবরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে, এতে ব্যবহৃত চিত্রকল্প ও প্রতীকসমূহ বিস্ময়করভাবে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এবং রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ গল্প লেখার প্রেরণা। গল্পটির শৈলীগত নান্দনিক উৎকর্ষ নিরূপণের লক্ষ্যে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা চিত্রকল্প ও প্রতীকের প্রতিনিধিত্বশীল দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। প্রসঙ্গত নিচের উদ্ধৃতাংশটি লক্ষণীয় :

> আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে, আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায় — কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ১)

আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র নদীঘাটের আত্মবিশ্লেষণের এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। লেখক বস্তুর ছায়ার নিয়ত-নবীনতাকে গঙ্গার নদীঘাটের চিরতারুণ্যের সঙ্গে তুলনা করে এক ইন্দ্রিয়াতীত সাধর্মকে অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছেন। গল্পকার সবেচেয়ে বেশি চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন কুসমের অনুভব, তার প্রেম ও আকুতিকে প্রকাশের উপায় হিসেবে। এর একটি নিদর্শন নিচে লক্ষ করা যেতে পারে :

> কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না– কুসুমের পশ্চাতে আশে-পাশে ঝোপে-ঝাপে গাছে-পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে, অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া, মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৫)

পরাবাস্তবতার মিশেলে সৃষ্ট অসামান্য এই চিত্রকল্পটিতে জ্যোৎস্নাকে চাদরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একইসঙ্গে রাতের অন্ধকারের ওপর মানবত্ব আরোপ করে তাকে জ্যোৎস্নার চাদর মুড়িয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ, 'অবারিত প্রসারিত' জ্যোৎস্নায় চারিদিক থেকে অন্ধকার মুখ লুকিয়েছে। অন্ধকারের এই লুকিয়ে পড়ার মধ্যে একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনাও রয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই বর্ণনার পরপরই কুসুমের সঙ্গে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ ঘটবে। কুসুমের জীবনে সন্ন্যাসীর আগমন যেন তার জীবনের অন্ধকার সরিয়ে আলোর পথে এগিয়ে আসা। তাই অন্ধকার মুখ লুকিয়ে কুসুমের জীবনে আলোকের উদ্ভাসন ঘটিয়েছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, অন্ধকার কিন্তু জ্যোৎস্নার চাদরে গা ঢাকা দিয়ে মুখে মুড়ি দিয়েছে মাত্র; চিরতরে দূরীভূত হয়নি। আর তাই কিছুদিন পরেই কুসুমের জীবন হয়ে উঠবে বেদনার্ত, গ্লানিময়। উল্লিখিত চিত্রকল্পে কুসুমের জীবনের আনন্দ আর হতাশার যুগপৎ সমন্বয় ঘটেছে। কুসুম যেহেতু ক্রমশ এই হতাশ হৃদয়ে নাস্তিত্বের দিকে এগিয়ে গেছে তাই তার এই চলে যাওয়াকে রবীন্দ্রনাথ আবারও অন্ধকারের অনুষঙ্গে উপস্থাপন করেন। প্রসঙ্গত নিচের দৃষ্টান্তটি লক্ষণীয় :

> অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৭)

কুসুমের আত্মহনন মুহূর্তের বিবরণের অংশ এটি। বিধবা হয়ে সন্ন্যাসীকে ভালোবাসার গ্লানিবোধ কুসুমের আগে থেকেই ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে সন্ন্যাসী স্বয়ং কুসুমকে তার কথা বিস্মৃত হতে নির্দেশ দিয়েছেন, ওই নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কুসুমের কাছে আত্মহননের পন্থাই নির্বিকল্প বলে বিবেচিত হয়েছে। আর এই আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী গঙ্গার সেই নদীঘাট। তার জবানিতে লেখক বলে চলেন এমন এক মৃত্যুদৃশ্য, যা প্রকৃতি নিজে থেকেই লুকিয়ে রাখতে চায়, অন্ধকারে মিশিয়ে দিতে চায়। ফু দিয়ে আকাশের তারা নিবিয়ে এক প্রগাঢ় অন্ধকারে গোটা আকাশমণ্ডলকে ঢেকে দিতে চায় প্রকৃতি। আর এই গাঢ় অন্ধকারেই সে লুকিয়ে রাখতে চায় কুসুমের অপরিসীম বেদনাকে। এভাবে, লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রকল্পের সুবিন্যস্ত প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পের শৈলীতে যোজনা করেন বিশেষত্ব, নান্দনিক উৎকর্ষ।

চিত্রকল্পের মতোই এই গল্পে প্রতীক ব্যবহারেরও রয়েছে বিশেষত্ব। কুসুম বারবার ফুলের প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে এই গল্পে। লেখক যেন, ফুলের ক্ষণস্থায়িত্বকেই নানাভাবে কুসুম চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান। সময়ের প্রবাহে ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখে গল্পকারের প্রিয় প্রতীক 'শৈবাল'। লেখক পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করে এই অনুষঙ্গগুলোকে প্রদান করেছেন প্রতীকের মর্যাদা। আবার একটিবার ব্যবহার সত্ত্বেও প্রতীকের মর্যাদা লাভ করেছে 'রাক্কুসি' শব্দবন্ধটি। কুসুমকে আদর করে ডাকার এই নামটি কুসুমের জীবনে অমোঘ নিয়তি হয়ে নেমে এসেছে। কুসুম যেন তার নিজের জীবনকেই

গলাধঃকরণ করেছে। আত্মধ্বংসের পথ বেছে নিয়ে বেদনা-রাক্ষসের কাছেই আত্মাহুতি দিয়েছে সে।

"ঘাটের কথা"-র শৈলীবিচারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গল্পোক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার। গল্পটিতে লেখক নদীঘাটের জড়তাকে পাঠকের কাছে লুকিয়ে রেখেছেন ক্রিয়াশীল ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। গতি এবং স্থিতি নিয়ে রবীন্দ্র-দর্শনের যে বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, এই ছোটগাল্পিক পরিসরে রবীন্দ্রনাথ তাকেই ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করতে আগ্রহী ছিলেন কি না সে বিষয়ে গভীরতর অনুসন্ধানের সুযোগ বিদ্যমান। তিনি ক্রিয়াপদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যত ব্যবহার করেছেন চলমানতা গুণের। সাধুরীতির সম্প্রসারিত অবয়বে ব্যবহৃত ক্রিয়াগুলি গল্পকারের উদ্দেশ্য অনুসারে তৈরি করেছে বিবৃতির এক গতিময় জগৎ। প্রসঙ্গত নিচের অনুচ্ছেদটি লক্ষণীয় :

> বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন **দেখিতে দেখিতে** ভরিয়া **উঠে**, কুসুম তেমনি **দেখিতে দেখিতে** প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া **উঠিতে লাগিল**। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা **করিয়া দিয়াছিল** যে, সে যৌবন, সে বিকশিত রূপ সাধারণের **চোখে পড়িত** না। কুসুম যে বড়ো **হইয়াছে** এ যেন কেহ **দেখিতে পাইত** না। আমি তো **পাইতাম** না। আমি কুসুমকে বালিকার চেয়ে বড়ো কখনো **দেখি** নাই। তাহার মল **ছিল** না বটে, কিন্তু সে যখন **চলিত** আমি সেই মলের শব্দ **শুনিতে পাইতাম**। এমনি করিয়া দশ বৎসর **কাটিয়া গেল**, গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন **জানিতে পারিলই** না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৩)

স্ফীত হরফে অনুচ্ছেদটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলোকে নির্দেশ করা হয়েছে। দেখা যাবে যে, সমাপিকা, অসমাপিকা উভয় প্রকার ক্রিয়াপদ ব্যবহারেই গল্পকার গুরুত্ব দিয়েছেন এদের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তাকে। অনুচ্ছেদটির অধিকাংশ ক্রিয়াপদই এক ধরনের চলমানতাকে নির্দেশ করে। এই বৈশিষ্ট্যটি আলোচ্য গল্পের শৈলীর একটি বিশেষ দিক।

"ঘাটের কথা" গল্পের শৈলীবিচারে লক্ষণীয় যে, এতে ব্যবহৃত শৈলী-বৈশিষ্ট্যের সূত্র ধরে আমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিহ্নের সন্ধান পাই, যা রবীন্দ্র-গল্পে বার বার ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে রয়েছে : নদীঘাট, ঋতুবদল, পুষ্প, আত্মহনন প্রভৃতি। তবে, রবীন্দ্র-গল্পে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক চিহ্নগুলোকে আমরা "ভিখরিনী"-তেই শিল্প-সংসক্ত অবয়বে প্রথম দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিসত্তা আরও আগে থেকেই প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গকে ছোটগল্পে বিধৃত করবার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছিল। তাছাড়া "ঘাটের কথা"-য় ঋতুর পরিবর্তনের সূত্র ধরে সময়ের এগিয়ে চলা তথা ঘাটটির অভিজ্ঞতাকে আরও বেশি বাড়িয়ে তোলার যে কৌশল রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন তার পুনর্ব্যবহার কেবল ছোটগল্পেই নয় বরং সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে বহুদৃষ্ট। একই কথা, পুষ্প চিহ্নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। "ঘাটের কথা"-র অন্যতম প্রধান চরিত্র কুসুমের নাম ফুলের নামে হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ আগ্রহে নানাভাবে ফুলের প্রসঙ্গ এনে যেভাবে কুসুমের মনকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন, তারও পরিচয় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে। কিন্তু যে দুটি চিহ্ন আমাদের আলোচ্য "ঘাটের কথা" গল্পটিকে বিশেষ নান্দনিকতায় উন্নীত করেছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ নদীঘাট এবং আত্মহনন

চিহ্ন। এছাড়াও গল্পটিতে ব্যবহৃত বিবরণ-রীতি, ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রভৃতিরও অনুসরণ লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন গল্পে। অর্থাৎ, এ কথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গল্পের শৈলীকাঠামো সৃজনে যেসকল কৌশল ব্যবহার করেছেন, তার অনেকগুলোরই প্রথম ব্যবহার ঘটেছে "ঘাটের কথা"-য়। এই গল্পটিই বীজপাঠ আকারে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শৈলী-আশ্রয়ী বিবিধ চিহ্নের চিহ্নবিশ্ব রচনা করেছে। আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা এই বিষয়টির আলোকপাতে সচেষ্ট হব।

গল্পশৈলীর চিহ্নবিশ্ব : রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র ছোটগল্প বিবিধ চিহ্নের সমাবেশ। তবে, আমাদের গৃহীত অনুকল্প অনুসারে এই চিহ্নসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য "ঘাটের কথা" গল্পে ব্যবহৃত চিহ্নের ঘনিষ্ঠ যোগ। বক্ষ্যমাণ আলোচনার পূর্ববর্তী অংশে শনাক্তকৃত চিহ্নসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য 'নদীঘাট' চিহ্নের প্রসঙ্গ। ঘাটের প্রসঙ্গ সাধারণত দুটি প্রধান দ্যোতনায় গল্পে ব্যবহৃত হয়। কূলে ফিরে আসবার জন্য যেমন ঘাটের প্রয়োজন, তেমনি কূল কিংবা কুল উভয়টি ছাড়বার জন্যও প্রয়োজন হয় এই ঘাটের। আর এই যাওয়া-আসার সময়ধারার সাক্ষী হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেই নদীঘাট। এরূপ বিবিধ দ্যোতনায় রবীন্দ্রনাথ রচিত "সমাপ্তি", "মেঘ ও রৌদ্র", "ক্ষুধিত পাষাণ", "অতিথি", "মণিহারা"সহ বিভিন্ন গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে নদীর ঘাটের প্রসঙ্গ। যদিও "ঘাটের কথা" গল্পের মতো আর কোনোটিতেই নদীঘাট কোনো চরিত্রপ্রতিম সক্রিয়তায় আবির্ভূত হয়নি, তবে উল্লিখিত প্রতিটি গল্পেই ঘাট বিশেষভাবে প্রতীকায়িত। "সমাপ্তি" গল্পে নদীঘাট কখনও মিলনের কখনও মুক্তির আনন্দ হিসেবে এসেছে। অপূর্ব ও মৃন্ময়ীর প্রথম সাক্ষাৎ, বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিবাহিত মৃন্ময়ীর একাকী ব্যর্থ অভিযান, কাউকে না জানিয়ে অপূর্ব ও মৃন্ময়ীর একত্রে মৃন্ময়ীর বাবার কাছে যাওয়া— এসব কিছুই নদীঘাটকে কেন্দ্র করে সূচিত ও সমাপ্ত হয়েছে। "ঘাটের কথা"-র নদীঘাটের তাৎপর্য এই গল্পে অনুপস্থিত। কিন্তু রবীন্দ্র-চেতনায় নদীঘাটকে গভীরতর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করবার কৌশলটি ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে "ঘাটের কথা"-র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সত্যই প্রকট হয়ে ওঠে "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে। গিরিবালার শ্বশুরবাড়ি যাত্রার কালে শশিভূষণের বিলম্বিত প্রেমানুভূতি এবং গিরিবালার অব্যক্ত বেদনার নীরব সাক্ষী হয়ে অবস্থান করেছে নদীঘাট। নিচের বর্ণনাটি লক্ষণীয় :

> ... সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল, সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনোমতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ২০৩)

শশিভূষণ ও গিরিবালার এই পরস্পরবিচ্ছিন্ন হৃদয়োপলব্ধিকে বেঁধে রেখেছে নদীঘাট। ঘাটে লোকের ভিড় যা দেখতে পায়নি, বেদনাসিক্ত গিরিবালার কাছে যা প্রত্যাশার অতীত ছিল, শশিভূষণের সেই জেগে ওঠা প্রেমাকুতিকে একমাত্র প্রত্যক্ষ করেছিল নদীঘাট। এর সঙ্গে মিলে যায় "ঘাটের কথা"-র কুসুমের ব্যক্ত প্রেম ও তার পরিণতির প্রসঙ্গ। কুসুমের মৃত্যুযাত্রাও একমাত্র নদীঘাটই প্রত্যক্ষ করেছিল। কেবল এই সাদৃশ্যই নয়, রবীন্দ্রনাথের বিবরণ উপস্থাপন কৌশলের ক্ষেত্রেও এই গল্পের সঙ্গে "ঘাটের কথা"-র মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ গল্পের চরম আবেগঘন মুহূর্তকে বর্ণনা করেন, সেই কৌশলটির সূচনা ঘটেছিল "ঘাটের কথা"-য়, আর এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পেও। নদীর ঘাটের জড় অস্তিত্বকে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ চলমান মানবজীবনকে অনুভব করতে চান। এই অনুভবের আস্বাদ রবীন্দ্রনাথ সরাসরি যেমন গ্রহণ করেন তেমনি নদীঘাটকেও তিনি করে তোলেন এর অংশীদার। তাই "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পে 'দেড়-শত-সোপান-ময় অত্যুচ্চ ঘাটের' ওপরে অবস্থিত প্রাসাদকে ঘিরে তিনি গড়ে তোলেন এক বিস্ময়কর গল্পের প্লট; "মণিহারা" গল্পে এই নদীঘাটেই বর্ণিত হয় গল্পের মধ্যে যে অতিপ্রাকৃত গল্পটি রয়েছে তার পুরোটা। আবার "অতিথি"-তে নদীঘাট তারাপদর বিশ্বপথ পরিক্রমায় যাত্রাবিরতি ও নতুন অভিযাত্রার সন্ধিস্থল। ঘাটেই তার বন্ধন, ঘাটেই তার মুক্তি। তাই গল্পের অন্তে আমরা দেখতে পাই :

> জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে;... সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা— চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ২৯০)

নদীঘাট তারাপদকে সামাজিক বন্ধন উপেক্ষা করে নতুন কোনো অজানা পথে এগিয়ে যেতে প্রলুব্ধ করে। এভাবে, নানা মাত্রায় রবীন্দ্রগল্পে ফিরে আসে নদীঘাট। বলা প্রয়োজন যে, এই ফিরে আসাটা কখনও পুনরাবৃত্তিমূলক নয়, অথচ অভিন্ন দ্যোতক বহুসংখ্যক দ্যোতিতকে আশ্রয় করে নতুন নতুন দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

"ঘাটের কথা"-য় উপস্থাপিত কুসুমের আত্মহনন প্রসঙ্গ চিহ্ন আকারে বিভিন্ন রবীন্দ্র-গল্পে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য "কঙ্কাল" গল্প। "কঙ্কাল"-এর কনকচাঁপাও কুসুমের মতো অকালবিধবা, আরাধ্য প্রেমিকের কাছ থেকে প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা। কুসুমকে সন্ন্যাসী প্রত্যাখ্যান করেছিল স্পষ্টভাবে, নিজের সন্ন্যাসব্রতর দোহাই দিয়ে; কিংবা এমনও হতে পারে সামাজিক মর্যাদার লোভকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি ওই সন্ন্যাসীর পক্ষে। যেমনটা চোখে পড়ে শশিশেখরের মধ্যেও; যে পণের লোভ অগ্রাহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত কাপুরুষোচিতভাবে কনকচাঁপাকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে, আত্মহত্যার আয়োজনে কুসুম এবং কনকচাঁপার মধ্যে ব্যবধান লক্ষ করা যায়। আত্মহত্যার জন্য কুসুম বেছে নিয়েছে জল, কনকচাঁপা বেছে নিয়েছে বিষ। কনকচাঁপার নিজ হাতে

সাড়ম্বরে সাজানো মৃত্যুশয্যা তার অপরিসীম অপমান আর যন্ত্রণাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে এক মর্মন্তুদ কৌতুকে :

> বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বরাণসী শাড়ি পরিলাম; যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৫৯)

এর বিপরীতে কুসুমের মহাপ্রস্থান অত্যন্ত সাদামাটা, আলোহীন; নৈঃশব্দ্যে নিবেদিত। কিন্তু বেদনার গাঢ়তায় কনকচাঁপার সমতুল্য। গল্পের এ সম্পর্কিত বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধে ইতোমধ্যেই বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখিত হলেও নিচে একত্রে তার পুনরুল্লেখ করা হলো :

> চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফু দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৭)

কুসুম এবং কনকচাঁপার মৃত্যু-বিবরণের এই পার্থক্য মূলত রবীন্দ্র-গল্পে ব্যবহৃত আত্মহনন চিহ্নের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারকেই আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে। গল্পের প্রধান চরিত্রের এই আত্মহনের বিবরণ উপস্থাপনের যে শৈলী রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তকৃত, তার ভিন্ন ধরনের উপস্থাপন লক্ষ করা যায় "জয়পরাজয়" গল্পে। কোনো প্রেম-প্রত্যাখ্যানের ঘটনা এই গল্পে ঘটেনি, এর বদলে একজন শিল্পীর প্রতিভার অনাদর আর অপমানের প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছে আত্মহত্যার ঘটনা। গোটা পৃথিবীর প্রতি এক গভীর অভিমান নিয়ে 'এক মোহনীয়, পরিতৃপ্ত' (ভীষ্মদেব, ২০১১ : ৪৯৩) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলে গেছেন অমরাপুরের রাজসভাকবি শেখর। এরূপ মহান হয়ে ওঠা মৃত্যু সবার ভাগ্যে ঘটে না; যেমনটি ঘটেনি "জীবিত ও মৃত" গল্পের কাদম্বিনীর জীবনে। প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বেই চারপাশের মানুষের কাছে সে হয়ে উঠেছে একজন মৃত মানুষ। শারীরিক মৃত্যুর অনেক আগেই তার মন গেছে মরে। তাই তার মনে হয় :

> ..., আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি— আমি যে আমার প্রেতাত্মা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৮৫)

মৃত্যুর চেয়ে অধিক এই যন্ত্রণা কাদম্বিনীকে নির্বিকল্পভাবে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে। আত্মহনন যেন তার কাছে অসমাপ্ত রয়ে যাওয়া জীবননাট্যের শেষ দৃশ্য। এই শেষ দৃশ্যে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তার জীবনাবসান ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, "ঘাটের কথা"-র আত্মহননের সেই শৈলী-চিহ্নই রবীন্দ্রনাথ নানা রূপে নানা মাত্রায় নিয়ে এসেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পে। তিনি কখনও গল্পের প্রেক্ষাপট পাল্টে দিয়েছেন, কখনও-বা আত্মহননের কারণ, তার যৌক্তিকতা, তার অনিবার্যতা প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বসেছেন; কিন্তু "ঘাটের কথা"-র সেই মৃত্যু তাঁর শিল্পীহৃদয়ে যে রেখাপাত করেছিল তা কখনোই অবসিত হয়নি। আর তাই আত্মহনন তাঁর গল্পে নানা ব্যতিক্রমী শিল্পকৌশলে এসেছে। আবার, আত্মহননের উপায় হিসেবে কিংবা ভিন্ন উপায়ে সংঘটিত মৃত্যুর সঙ্গে জলের সম্পর্ক রয়েছে— এমন গল্পও এই আলোচনার প্রাসঙ্গিক; কেননা, "ঘাটের কথা"-য়

জল-নিমগ্ন হয়েই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই সূত্র ধরে "জীবিত ও মৃত" গল্পের কাদম্বিনীর কাছে আবারও ফিরে যেতে হয়। আত্মিক মৃত্যুতে অবসিত-প্রায় কাদম্বিনীর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে 'অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে' নিমজ্জিত হয়ে। "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"-এ অবোধ শিশুর মৃত্যু ঘটেছে জলে ডুবে। "ছুটি" গল্পে মাতৃস্নেহ-কাতর ফটিকও জলে ভিজে জ্বরাক্রান্ত হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

"ঘাটের কথা"-র আত্মহননকে ঘিরে জলের যে প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-ছোটগল্পে আমরা দেখতে পাই, তার আর একটি বৈশিষ্ট্য এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কুসুমের আত্মহত্যার কালে 'জলের শব্দ' শুনতে পেয়েছিল নদীঘাট। এই শব্দ-প্রতীকই ফিরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন রবীন্দ্র-গল্পে। "জীবিত ও মৃত" গল্পে জমিদার শারদাশঙ্কর কাদম্বিনীর আত্মহত্যার কালে 'ঝপাস' শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"-এ মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনায় আমরা পাই: 'একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল'। জলের এই 'ঝপাস' বা 'ঝপ' শব্দ এভাবে বিভিন্ন গল্পে স্বতন্ত্র দ্যোতনা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে জলের প্রাসঙ্গিকতাকে বহুমাত্রিক করে তোলে।

সবশেষে, ব্যতিক্রমী একটি আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরা দরকার। এ-পর্যন্ত আলোচনায় উল্লেখিত আত্মঘাতী ঘটনাগুলোতে যারা আত্মহত্যা করেছে তারা সবাই সংশ্লিষ্ট গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু "পয়লা নম্বর" গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিলা আত্মহত্যা করেনি, করেছে তার অত্যন্ত স্নেহের ছোটভাই। পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে না পেরে ভাই-এর এই আত্মহত্যার পিছনে অনিলা তার ফাঁপা মনের অধিকারী স্বামীকেই দায়ী করেছে। আর ভাই-এর আত্মহত্যাই অনিলাকে স্বামী-পরিত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে অটল রেখেছে। এভাবেই নানা বৈচিত্র্যে আত্মহনন রবীন্দ্র-গল্পে চিহ্ন হয়ে আবির্ভূত হয়েছে, যার বীজরূপ সংরক্ষিত আছে "ঘাটের কথা"য়।

উপসংহার

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের বিস্তৃত পরিসরে "ঘাটের কথা"-র এই ছায়া ফেলা রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার একটি বিশিষ্ট দিক। "ঘাটের কথা" আমাদের অপার বিস্তারী রবীন্দ্র-সম্ভাবনার কথা ইঙ্গিতে জানিয়ে যায়। তাঁর শৈলীগত নিজস্বতার প্রান্তগুলোকে অণু-অবয়বে আমাদের কাছে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতনভাবে, এই গল্প থেকে তাঁর অন্য অনেক গল্পের শৈলী-ভাবনার কাঠামো নির্মাণ করেছেন; আবার বাতিল করেও দিয়েছেন অনেক কিছু। যেমন, "ঘাটের কথা"-র বাক্যগঠনের কৌশলটিতে খুঁজলে হয়তো তাঁর পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের প্রভাব পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ অতি দ্রুত এই রীতি থেকে সরে এসেছেন কিন্তু বাক্যগঠনের মধ্যে যে গীতলতা ছিল তাকে ঠিকই নতুনতর মাত্রায় ব্যবহার করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বলা যায়, "রাজপথের কথা" গল্পের বাক্যগঠন রীতির সঙ্গেই আলোচ্য গল্পের বাক্যগঠনের সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। অথচ, বাক্যকে সুগভীর বোধে উদ্দীপ্ত করবার যে কৌশলের শিল্পযাত্রা তিনি "ঘাটের কথা"-য় শুরু করেছিলেন তা "ল্যাবরেটরি" কিংবা "রবিবার"-এর মতো একেবারেই ভিন্ন প্রকারের গল্পেও অব্যাহত ছিল। একইভাবে,

সময়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অলংকার ও চিত্রকল্প ভাবনা পাল্টে গেছে অনেকখানি। "পোস্টমাস্টার" গল্পে প্রদীপের মিটমিট আলোয় ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করে 'একটি মাটির সরার উপর টপ টপ করিয়া বৃষ্টির জল' পড়ার চিত্রকল্প তৈরি করে রতনের বোবা বেদনাকে তুলে ধরবার যে শৈল্পিক আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় তার শিল্প-সমৃদ্ধির উৎস "ঘাটের কথা"-র বিস্তৃত চিত্রময় ভাষার সম্ভার। আবার একইভাবে "রবিবার" গল্পে অভীক যখন বিভাকে লেখা চিঠিতে জানায় 'এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্ত দিয়ে', তখন সেই নান্দনিক আকুতির শিকড়ও প্রোথিত থাকে "ঘাটের কথা"-র ভাষাশৈলীর কাঠামোর মাঝে। এইসব অন্তর্বাহী শৈলী-চিহ্ন "ঘাটের কথা" গল্পের প্রাণ; দ্যোতনাশক্তিতে এরা গড়ে তোলে রবীন্দ্র-গল্পশৈলীর চিহ্নবিশ্ব।

আকরগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বা. ১৩৯৮)। *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

সহায়কগ্রন্থ

অমলেন্দু বসু (২০০৮)। *প্রবন্ধ সংগ্রহ* । (সম্পা. ধীমান দাশগুপ্ত) বাণীশিল্প, কলকাতা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০১১)। "রবীন্দ্র-ছোটগল্পে মৃত্যু", (সম্পা. মোবারক হোসেন, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৯৭)। "উৎস থেকে স্রোতস্বতী", *প্রসঙ্গ : কথাসাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Lotman, Yuri M (2005). "On the semiosphere", (Translated by Wilma Clark), *Sign Systems Studies*, Vo l: 33.1

Nils Erik Enkvist & et al (1964). "On Defining Style", in *Linguistics and Style*. Oxford University Press, Oxford.